নীরেন্দ্রনাথকে পাঠ করা আমার কাছে এক পাঠক্রম

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সব কবির কাছে সবরকম প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়াতে নেই, দরকারও নেই তার। জীবনানন্দকে বুঝে নিতে হয় তাঁরই নিজস্ব ঘরানা দিয়ে, মনন ও মনীষার সৌজন্যে যেমন সুধীন্দ্রনাথ কিংবা বিষ্ণু দে-কে, মূলত গদ্যের আঙ্গিককে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন ওঠেন সমর সেন, তাঁর পাশেই অরুণ মিত্র, আবার আপাতমস্তক কথ্যভঙ্গির আদর্শ কবিপুরুষ হিসেবে বিবেচিত হন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এভাবেই এক-একজন কবি এক-একটা জোরের জায়গা থেকে গড়ে তোলেন তাঁদের চরিত্রবান উচ্চারণ, যার দৌলতে সহজ হয় তাঁদের কবিকৃতিকে শনাক্ত করা। নিছক ভাবাশ্রিত রোমান্টিক তন্ময়তাকে পুঁজি করে যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের কাছে নগ্ন রূঢ় বাস্তবতার ছবি আশা করাটা সঙ্গত নয়; যেমন সঙ্গত নয় যে-কবি কবিতার শরীরে আজীবন শুধু গদ্যকেই মান্যতা দিয়ে এলেন, তাঁর কাছে ছন্দ-নিরীক্ষার কোনো দৃষ্টান্ত খোঁজ করা। আসলে এসবই নির্ধারণ করে দেয় এক-একজনকে চিনে-নেওয়ার-মতো তাঁদের সবিশেষ অবস্থান, জোরের জায়গাটা এভাবেই নিজস্ব স্বরায়নের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে সময়ান্তরে।

কবিতার প্রেক্ষিতে এসব প্রত্যক্ষণ যাচাই করে নেওয়ার অবকাশে আমাদের বুঝে নিতে হয় নীরেন্দ্রনাথ কোনো ব্যতিক্রমী উদাহরণ নন। 'নীলনির্জন' থেকে যে-তিনি একদিন যাত্রা শুরু করেছিলেন, আর এই সাম্প্রত সময়ের তিনি, এ-দুয়ের মধ্যে তেমন আমেরু ব্যবধান না থাকলেও একটা সূক্ষ্ম তফাত যে ভেতরে-ভেতরে গড়ে উঠেছিল, পাঠক হিসেবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়েছে বারবার। কবি নিজেও জানতেন জোয়ারে জায়গাটা তাঁকেই তৈরি করে নিতে হবে, দাঁড়াবার মতো জমিটাকে শক্ত করতে হবে স্বদক্ষতায়, অন্য পাঁচজনের থেকে ভিন্নতর স্বরে কথা বলতে হবে একেবারে নিজস্ব মুনসিয়ানায়, মিশিয়ে দিতে হবে বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে আঙ্গিকের সাযুজ্য, এবং লিখতে হবে যা-কিছু সরাসরি চোখ কান খোলা রেখেই, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সাক্ষী রেখে। সতর্কতার সঙ্গে সংযমের অভূতপূর্ব মিশেলে এই কাজটাই করে গেছেন তিনি আদ্যন্ত। নিজেকে ভেঙেছেন নিরন্তর, বিশ্বাস রখেছেন শিল্পিত বিনির্মাণে, ভাঙচুর থেকেই এগিয়ে গিয়ে কড়া নেড়েছেন নিত্যনতুন বিষয়ের দরজায়, হাট করে খুলে দিয়েছেন অনেক দিনের দমচাপা অর্গলিত ভাবনার জানলা। লিখতে হয়েছে অনেক, দাবি মেটাতে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে অগণন, প্রধান কবিতার পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে অঢেল গৌণ কবিতা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তাঁর ৩০-টি ছাপিয়ে - যাওয়া বইয়ের একটা কবিতাও উদ্ধৃত্ত নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়, বরং জরুরি, অনিবার্যরকমের জরুরি। কুড়িটা কবিতাকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছে দুশো-র ওপর কবিতা, ধাপে-ধাপে রাস্তাটা চিনে নেওয়ার জন্য, এক পর্ব থেকে হাত বাড়িয়ে পরের পর্বটাকে ধরার আকাঙ্ক্ষায়, নিজেকে ক্রমপরিণতির দিকে পৌঁছে দেওয়ার অপ্রতিরোধ্য তাগিদ থেকে। এই যে প্রতিনিধিত্বসূচক উচ্চারণের পাশে বাড়তিও লিখতে হয় একজন কবিকে, বলতে পারি, এই নিরুপায় নিয়তির সামনে আসলে বাধ্যতামূলক দাঁড়াতেই হয় প্রত্যেককে। দাঁড়িয়ে, তাঁকে ক্রমাগত রচনার সঙ্গে লগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত লিখে যেতে হয়; তার মধ্যে কোনো - কোনোটা অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়ে উন্মোচিত করে কবির বিশিষ্ট স্বভাবী লক্ষণ, হয়তো-বা আবার শেষ-কিছু তেমন সাফল্যসম্ভব আর হয়ে ওঠে না তাঁর হাতে। তবু এইসব মিলিয়েই একটা গোটা চালচিত্র ঘিরে থাকে তাঁকে, চূড়ান্ত সমীক্ষা-মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সর্বাঙ্গীণ কবিতাকৃতির সমগ্রতা।

এটা ঘটনা এবং সার্বিকভাবে গ্রাহ্য এক সত্য যে প্রত্যাশিতভাবেই নীরেন্দ্রনাথ জীবনানন্দের মতো লেখেন না, লেখেন না সুধীন্দ্রনাথ কিংবা বিষ্ণু দে-র আদলে, পরবতী প্রজন্মের সুনীল-শক্তি-র সঙ্গে তাঁর দূরতম মিলও নেই। তিনি লেখেন অবিকল নীরেন্দ্রনাথের মতোই, সেখানে অন্য কারোর অনুরকণ নেই, অনুসরণ নেই, বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই; যদি দ্বিতীয় আর কারোর প্রভাবসম্পতী প্রতিপত্তি টের পাই আমরা তাঁর উপস্থাপনায়, সে প্রতিপত্তি তাঁর নিজেরই অর্জিত সম্পন্নতা। হেঁটে এসেছেন অনেকখানি পথ, যে-পথের নাড়ীনক্ষত্র, হালহকিকত, সন্দেশ-সমাচার সব তাঁর করায়ত্ত, বাস্তবকে নির্ভুল চেনেন হাতের তালুর মতো। যে-পথ দিয়ে যাবতীয় দৃশ্যের সাক্ষী হতে-হতে এগিয়ে গেছেন তিনি, যার যার সঙ্গে বিনিময় হয়েছে তাঁর টুকরোটাকরা কথোপকথন, যে-রাস্তার ধুলো-বালি-কাদা মাড়িয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে প্রতিদিবসীয় অভিজ্ঞতার খোরাক সংগ্রহ করার জন্য, সে-সব বিষয়ে কোনো ভুল বার্তা দিয়ে যাওয়ার মানুষ নন তিনি। একটা স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু করেছিলেন সেই কবে, যা ছিল কবিতার কাছেই সমর্পিত অমোঘ এক অঙ্গীকার, কবিতাকে মান্যতা দিয়েছেন মাতৃভাষার বিকল্প হিসেবে, হাজার দরজা ভালবেসেও তারই 'বন্ধ দুয়ারে' মাথা কুটতে দেখেছি তাঁকে, নিজের হিসেবে, হাজার দরজা ভালবেসেওে তারই 'বন্ধ দুয়ারে' মাথা কুটতে দেখেছি তাঁকে, নিজের দিকেই ছুঁড়ে দেন উত্তরসম্মত এক প্রশ্ন: 'আমাকে নাকি ভীষণ জানে সকলে,/ তোমার থেকে বেশি কে জানে, কবিতা?' আর ওই যে সংকল্পের কথা বলছিলাম যা তাঁকে অটুট আত্মবিশ্বাস যুগিয়ে এসেছে এযাবৎ, যার মধ্যে সৎ কমিট্‌মেন্টের আন্তরিকতা ছিল আমাদের কাছে বরাবরের মতো শিক্ষণীয় এক দৃষ্টান্ত, সে-কথা শুনে নেওয়া যাক তাঁরই জবানিতে:

কবে আমার উচ্চারণ নির্ভুল হবে? আদৌ হবে কি? কবে আমি
সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠব? আদৌ উঠব কি? এখনও আমি
জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, এক বালকের কাছে আমি
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম যে, তার ভাষা একদিন

শুদ্ধ হবে। তার অস্ত্র একদিন সূর্যালোকে ঝকঝক করে উঠবে।

কবির কাছে প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছে করে, সেই বালক আজ সাতাশি বছরে ঝকঝকে সূর্যালোকে কতখানি শুদ্ধতর উচ্চারণের পথ বেয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারলো? অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় কবির নয়, আমাদের, একান্তভাবেই আমাদের। আর আমাদের সঙ্গে সেই বালকই আজ বলতে পারবে কখন আর কীভাবে তার কাঙ্ক্ষিত ভাষা এতদিনে শুদ্ধ হয়ে উঠলো তারই হাতে।

আরো একটা প্রচ্ছন্ন সংকল্প ছিল তাঁর, যার কথা তিনি নিজের থেকে হয়তো বলেননি কোথাও-কখনো। তা দিনে-দিনে ক্রমপ্রকাশ্য হয়েছে পাঠকের কাছে। তিনি বাংলা কবিতাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন অকারণ ভাবালুতা, রোমান্টিক ধূসরিমা এবং আর্দ্র সেন্টিমেন্ট থেকে। মানুষ-মানুষীর আবেগসর্বস্ব প্রেমকে ঘিরে যে বহুযুগবাহিত ট্র্যাডিশন, অতিরঞ্জিত ঐতিহ্য, অতিকথনের আতিশয্য, সেসব থেকে স্বেচ্ছায় একধরনের নির্বাসনকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি, কবিতাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এমন একটা নিশ্চিত নিরেট জমির ওপর যেখানে অলীক ভাববিলাস বা বিহ্বল চিত্তচাঞ্চল্যের কোনো অনুমোদন নেই। আবেগ থেকে সরে এসে মেধাবী উচ্চারণের দিকেও অভিমুক তৈরি করে নিতে পারত তাঁর কবিতা, মননশীল হতে পারত যাবতীয় চর্চা-নিরীক্ষা। কিন্তু সেটাও ঘটল না তাঁর বেলায়, ঘটতেই দেয়নি তিনি। যেটা ঘটল তা হলো, এ-দুয়ের বদলে তিনি সরাসরি উপজীব্য করলেন একেবারে চোখে-দেখা ও কানো - শোনা বাস্তবতাকে। এক-কেটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের রাত্রিকে ফিরিয়ে আনলো, এক-একটা কবিতা বুঝি রমণীর নখে, ওষ্ঠে জঙ্ঘাদেশে, হাতের মুদ্রায় ফুটে উঠলো বিষাক্ত ফুলের মতো। বাংলা কবিতার বুকের বাঁদিকে এভাবেই একদিন প্রবল ধাক্কা মেরেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ, হুল ফুটিয়েছিলেন অহেতুক সেন্টিমেন্টের সর্বাঙ্গে, তুলে এনেছিলেন বিষয় ও ভাবনা রাস্তাঘাট থেকে, দগ্‌দগে বাস্তব জীবন থেকে, বিরল সমার্থ্যে প্রায় টোকা মেরে বদলে ফেলতে পেরেছিলেন এতদিনকার মজ্জাগত বদ্ধমূল ভাষার ধরনধারণ। শুনে নেওয়া যাক তাঁর অল্পপঠিত একটি কবিতার ছিন্নংশ,

আমি একজন ধিনিকেষ্ট,
কলম পিষতে বড়বাজারে যাই,
পিষি,
সাবান কিংবা তরল আলতার শিশি
কিনে বাড়ি ফিরি, গিন্নী
কলঘরে ঢুকলে বাচ্চা সামলাই।
আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা না-করা সমান,
ভোটারদের আলজিভ না দেখিয়ে যাঁরা বক্তৃতা দিতে পারে না
আপনি বরং তাদের কাছে চান।
আমার এখন তাড়াতাড়ি
শ্যামবাজার যেতে হবে। সঙ্গে যদি আসতে চান, আসুন,
লজ্জা-টজ্জা না করে একটু শব্দ করে কাসুন,
তাহলেই আপনার বাস ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে পারি।

রাজপথে কিছুক্ষণ

আগে থেকে পড়া না থাকলেও দীক্ষিত পাঠকের নিতে সময়বিলম্ব হয় না যে এ-কবিতা সংশয়াতীতভাবে নীরেন্দ্রনাথেরই কবিতা, 'নিজ হাতে নিজস্ব ভাষায়' এর নির্মাণজাত কারিকুরির পেছনে একমাত্র তাঁরই ছাপ। আর এটাও আমাদের একই সঙ্গে বুঝে নেওয়া দরকার যে পথ-চল্‌তি এই লঘু চালের জুতসই ভাষাকে কবিতার উপাদানে কাজে লাগানোর জন্য যে দুর্জয় সাহস ও প্রতাপী স্পর্ধা জরুরি হয়ে ওঠে, তা ছিল তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায়; তবে ছিল বলছি কেন, আজো তা অব্যাহত তাঁর যে-কোনো এই মুহূর্তের লেখা কবিতায়। দেখা যাক হাল-আমালের একটি বিষয়ভাবনার সপ্রতিভ বিন্যাস কত ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র তাঁর উপস্থাপনার মুনশিয়ানায়,—

মল্‌ময় অজস্র পণ্য ভারী কায়দা করে
সাজানো রয়েছে।
তার ভিতরে কোন্‌টা তুমি চাও?
যেটা চাও, সেটা নইলে সত্যি কি তোমার
সংসার অচল হয়ে যাবে?
একটু ভেবে দ্যাখো,
অজস্র পণ্যের মধ্যে কোন্‌টা সত্যি-সত্যিই দরকার,
আর কোন্‌টা ছাড়াও জীবন
যেমন চলছিল তেমনই চমৎকার চলে যেতে পারে।

কথাটা যাদের বলি, তারা প্রত্যেকেই মাথা নাড়ে,
বলে যে, যে, এটাই খাঁটি কথা।
কিন্তু পরক্ষণে তারা, সম্ভবত অভ্যাসবশত,

যে যার ট্রলিতে
তুলতে থাকে চিত্তহারী মোড়কে জড়ানো
সেই সমস্ত মাল
যার চোদ্দো অনা বাদ দিয়েও জীবন
স্বচ্ছন্দে কেটেছে এতকাল।

নীরেন্দ্রনাথের বহুশ্রুত আপ্তবচনকেই আমি আরো একটু ব্যাপ্ত অর্থে পেশ করে বলতে চাই 'কবিতায় গদ্যই আমার মাতৃভাষা।' এই আঙ্গিরে প্রবর্তনাও তিনি ঘটিয়েছিলেন একান্ত নিজস্ব এক নির্মাণরীতির সৌজন্যে। যেন গদ্যেই কথা বলে যাচ্ছেন, টানটান টানা গদ্যে, অথচ ভেতরে-ভেতরে আগাগোড়া সক্রিয় থাকছে ছন্দসমেত এক গঠনকারু। একদিকে মসৃণ গদ্যের নির্ভার প্রসাদ বা পাঠককে মুহূর্তেই অন্তরঙ্গ করে তোলার ক্ষমতা রাখে, অন্যদিকে লুকিয়ে - রাখা কবিতাস্পন্দনের ছদ্মপোষাক। দুটি উদ্ধৃতির প্রসঙ্গেই এ-কথাগুলোকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। তাঁর গদ্যের যাঁরা নিয়মিত পাঠক। যুগপৎ তাঁর কবিতারও, তাঁরা বুঝে নিতে পারবেন প্রাত্যহিক যাপিত জীবন থেকে নিষ্কাশন করে নেওয়া যায় যে গদ্যকাবিতার উপকরণ ও প্রকরণ, তার ওপরেই সামান্য প্রসাধনের প্রলেপ লাগিয়ে তিনি কবিতার শরীরে গড়ে তোলেন ছন্দ-মিলের এক অন্যস্বাদ আবহ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিকে সামনে রেখে আরো একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা সেরে নিই। কথাটা প্রান্তিক মিল সম্পর্কিত। সর্বাঙ্গে এই মিল থাকুক বা না থাকুক, নীরেন্দ্রনাথ তাঁর অনেকানেক কবিতায় এক প্রিয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন : দুটি স্তবকের মাঝখানে যে 'স্পেস্', তার ওপর ও নিচের পঙ্ক্তির মধ্যে তিনি স্থাপন করেন তাঁর অপ্রত্যাশিত পারস্পরিক অন্ত্যমিল। মুহূর্তেই প্রাকরণিক অভিনবত্বের সম্ভাবনা সমৃদ্ধ করে আমাদের। ওপরে যেমন প্রথম স্তবকের শেষ লাইন ছিল : 'যেমন চলছিল তেমনই চলে যেতে পারে,' — তারপরে পূর্ণচ্ছেদ। অতঃপর 'স্পেস্', দম নেওয়ার মতো সামান্য বিরতি। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম লাইন এবার জুটিয়ে নিচ্ছে অবধারিত এক প্রান্তিক মিল : 'কথাটা যাদের বলি, তাদের প্রত্যেকেই মাথা নাড়ে।' শুধু চর্চিত এই মিলের বিশেষ চরিত্র থেকেও আমরা শনাক্ত করে নিতে পারি তাঁর বহু প্রতিনিধিত্বসূচক কবিতাকে। আমার পর্যবেক্ষণের সমর্থনে আমি এখানে আরো দুটি কবিতার উল্লেখ রাখতে চাই।—

১. দোয়েল, আমাকে তুমি ছেড়ে চলে গেছ বহুদিন।
যেমন শৈশব গেছে, পাঁচালি ও ব্রতকথা গেছে
যেমন দিঘির বুকে শ্রাবণের দুপুরে বৃষ্টির
খই ফোটাবার খেলা, তাও
বিগত জন্মের গূঢ় রহস্যের মতো মনে হয়।
দোয়েল, তুমিও ঠিক সেইমত বিগত জন্মের
পাখি হয়ে রয়েছ আড়ালে।
আকাশের বৃক্ষে আছে মুক্তাফল, শবরের জালে
তাকেই ধরার চেষ্টা চলে আজও। কখনও-কখনও একটি-দুটি
ধরা পড়ে যায়।
যে ধরা পড়ে না, সেই অধরার চঞ্চল ডানায়
কিছু লোক শান্তি খুঁজে পেয়েছিল, আর কিছু লোক
জীবনের পরিপূর্ণ ছুটি। দোয়েলের দিন

২. রাস্তাটা তো পাঁচ-দশ মাইল নয়, বড্ড বড়, হেঁটে যেতে-যেতে
যেমন আনন্দ, তেমনি এখানে-ওখানে
কিছু দুঃখকষ্টও পেয়েছি।
তা নিয়ে আক্ষেপ নেই কিছুমাত্র, কেননা জানতুম,
যেমন আনন্দ, তেমনি কষ্টও কপালে
লেখা থাকে। থাকুক গে, মন্দ কী,
ধপধপে চালের মধ্যে ছোট-ছোট কাঁকরের মতো
একটু-একটু দুঃখকষ্ট মিশে থাকা ভাল।
কিংবা, একটু অন্যভাবে বলি,
যাবতীয় দুঃখকষ্ট মিহি ধুলোবালির মতন
পাটাভাঙা জামায়
লেগে থাকা ভাল। তাকে আঙুলের আলতো টোক মেরে
বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া ভাল। আর
উড়িয়ে দেবার পরমুহূর্তে যা ভাল,

তা হল সুন্দরভাবে, দুর্দান্ত সুন্দরভাবে
হেসে ওঠা।
যেমন ভূগর্ভ থেকে রোদ্দুরের মধ্যে ফুল ফোটা
দুর্দান্ত সুন্দর।
আমি তেমনভাবে হেসে উঠতে পেরেছি কখনও?
না না, আমি কখনও পারিনি।

পাবার চেষ্টাটা কিন্তু এখনও ছাড়িনি।
পারা কি সহজ? এতো আলগা ধুলো কিংবা বালি নয়।... মূল্য দিয়ে দেব

'যাবতীয় ভালবাসাবাসি' এবং 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' থেকে নির্বাচিত ওপরের দুটি উদ্ধৃতি হয়তো একটু বেশি জায়গা নিয়ে নিল, তা নিক। এই দুটি কবিতার কোনোটিরই পাঠবিখ্যাতি নেই, তবু আমি আমার এ-সমীক্ষায় এদের অন্তর্ভূক্ত করলাম কয়েকটি কারণে। দেখবার মতো এদের অবিকল গদ্যের ফর্মাট, আর ভেতরের ছন্দের চোরাস্রোত। অন্যভাবে সাজিয়ে দিলে এদের আদ্যোপান্ত গদ্যের মতোই দেখাবে, এবং খুঁটিয়ে না - পড়লে ধরাও যাবে না যে নিখুঁত ছন্দের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে এদের সামগ্রিক বিন্যাস। দ্বিতীয়ত, যেন কবি কথা বলছেন সামনে কাউকে দাঁড় করিয়ে রেখে, ফাঁকা মাঠে গিয়ে নয়। 'রাজপথে কিছুক্ষণ', 'শপিং মল-এ' এবং 'মূল্য দিয়ে দেব' —এই তিনটি কবিতা সেই ধাঁচেরই, স্বগতোক্তি নয়, নেপথ্যে যেন সম্বোধনসূচক। তৃতীয়ত, বিষয় অনুযায়ী ভারিক্কি নয় তাঁর কথা বলার চাল, বরং লঘুভঙ্গিম উপস্থাপনায় কথ্যভাষার আদলটাই তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে যা তিনি বলতে চান, আর তার মধ্যেই মিশে থাকে একদিকে অল্প - একটু তির্যক ভঙ্গি, অন্যদিকে গভীর জীবন-দর্শনেরও হঠাৎ ঝলক। চতুর্থত, আপাততুচ্ছ অতিসাধারণ বিষয়কেও কবিতাভাবনার উপাদানে রূপান্তরিত করে শুধুমাত্র পরিবেশনার গুণে তাকে অন্যমাত্রিক করে তোলা। এবং পঞ্চমত, তাঁর ওই মনোমত পছন্দসই অন্ত্যমিলের প্রবণতা, এক স্তবক থেকে স্তবকান্তরে যাওয়ার অবকাশে দুটি পঙ্ক্তির মধ্যে সাবলীল দুটি প্রান্তিক মিলের অবতারণা।

কথা হচ্ছিল নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় লুকিয়ে-থাকা ছন্দের আড়ালেও তাঁর গদ্যস্বভাব নিয়ে, গদ্যধর্মিতা নিয়ে। প্রাসঙ্গিকভাবেই বলি, গদ্যের একটা প্রিয় পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করে থাকেন তাঁর কবিতার ক্ষেত্রেও : গদ্যের দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে কথাকে প্রসারিত করে টেনে নিয়ে যান তিনি তাঁর বক্তব্য, তীব্রতার সঞ্চারে যা তাঁর কাছে অবধারিতভাবে কার্যকরী। তাকানো যাক দুটি নজিরের দিকে :

১. আগেই বলে নিয়েছি, সাহিত্য একটা কাজ। তা যদি হয়, সাহিত্যিকের কাছেই বা সমাজ তার সেবা পবে না কেন?

সাহিত্যিকের কাছেও পাবে। তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে।

—লেখার লক্ষ্য

২. দরকারি কথাটা হচ্ছে এই যে, কবিতা-বিষয়ক এই সহজ সমাধানটি হুইলারও আসলে তাঁর আলোচনাকে এগিয়ে নেবার সুবিধার জন্য গ্রাহ্য করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও একে চূড়ান্ত সমাধান বলে মানেন কি।

মানছি না, বলাবাহুল্য, আমরাও। কেননা, আমাদের চিত্তে ইতিমধ্যে অন্য - একটি জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে।

—কবিতা কী

এর পাশে রাখি সমান্তরাল ভাষামুদ্রা ও আঙ্গিকে জারিত তাঁর কবিতা থেকে নির্বাচিত তিনটি জরুরি দৃষ্টান্ত :

১. আমিও তখন আর রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকি না,
নিঃশব্দে সরে আসি।

কেন সরে আসি, তোমরা জানো।
আমার প্রতিপক্ষ চায়,
তার নিয়মে এই যুদ্ধটা আমি চালাবো —এই যুদ্ধ

২. প্রত্যেকেই জেনে গেছে নিজের সীমানা।
অথচ প্রত্যেকে তারা আম্রফল চেয়েছিল আমলকীর গাছে।

চেয়েছিল একদা। এখন
প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছে, গাছ বলতে কিছু আর নেই। তিন ফুট কবিতা

৩. অন্য-সবাই ঘুমিয়ে আছে। একটা মানুষ দাওয়ায়
মধ্যরাতে জাগছে। ঝোড়ো হাওয়া

ঘরবাড়ি আর গাছপালাকে কাঁপিয়ে দিয়ে ছোটে।
হঠাৎ-হঠাৎ মেঘের মধ্যে ফোটে
একটি-দুটি তারা।
কেউ দেখে না, অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে পাড়া।

কেউ দেখে না। একটামাত্র মানুষ দেখে সবই।
অন্ধকারের মধ্যে আলোর ছবি
সে-ই ফোটাচ্ছে, এবং দেখছে। একলা তুলি হাতে
দাওয়ায় বসে জাগছে লোকটা এখন মধ্যরাতে।

একটা মানুষ

প্রত্যাশা রাখি, আমার ওপরের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে গদ্য-পদ্যের সমাহারে এই যে দুই পর্বের ক'টি দৃষ্টান্ত তা থেকে এবার এ-সত্য প্রতিষ্ঠা পাবে, কীভাবে গদ্যে এবং কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে কথাকে এগিয়ে নিয়ে যান, অনুচ্ছেদ কিংবা স্তবকের সাময়িক বিরতির পর আগের কথাকে গড়িয়ে নিয়ে যান পরের ধাপে, সেই সূত্রে তৈরি হয়ে যায় একটা বিষয় সংহতি, একই সঙ্গে কীভাবে সমগ্র উপস্থাপনার মধ্যে অনায়াসে অন্বিত হয়ে যায় ঘনবদ্ধ যুক্তির বিন্যাস। আর সেই বিন্যাসের মধ্যে, বাক্চরিত্রের মধ্যে ভুলেও থাকে না কোনো ফাঁকফোকর, শৈথিল্য, কিংবা সামান্যতম কোনো জড়তা। তাঁর প্রধান ও গৌণ যে-কোনো ধরনের উচ্চারণরীতির মধ্যেই তাই প্রচ্ছন্ন ভাবে কাজ করে যায় এই ঠাসবুনট ঘনবদ্ধ উপস্থাপনা, পরিবেশনায় আঁটসাঁট হতেই তিনি ভালোবাসেন, আলগাভাবে কোনো-কিছুই বলা তার মেজাজবিরুদ্ধ।

এ-লেখার প্রথম দিকে নীরেন্দ্রনাথের কবিতাচারিত্র নিয়ে কথা বলার অবকাশে আমি তাঁর দুটি সংকল্পের ঘোষণা রেখেছিলাম, উদাহরণসমেত বলেওছিলাম কিছু কথা। তাঁর তৃতীয় একটা সংকল্পের কথ্য এখানে না বললেই নয়। একটি সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনতে হয়, 'অন্তরীপ' পত্রিকার সৌজন্যে যা নেওয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তাঁরই জবানিতে শুনে নেওয়া যাক:

> আমার তিন জগৎ ১. কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ২. রবীন্দ্রনাথ, ৩. জীবনানন্দ। এরই মধ্য দিয়ে ছিল নিজের পথ করে নেওয়া। বেরিয়ে আসতে পেরেছি কিনা জানি না। তবে একটা ইচ্ছে ছিল সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলব, কিন্তু সংস্কৃতের উত্তরাধিকারও ছাড়ব না। কোনও শব্দই বর্জনীয় নয়, সব শব্দই ব্রাহ্মণ। প্রতিদিনের যে ভাষা, মুখের ভাষা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তা নিয়ে ভাল কাজ করেছেন, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তার উল্টোদিকের শব্দ ব্যবহার করবেন না।
>
> ...'পোয়েটিক ডিকশন' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাটা ভাল লাগে না। জনসন, গোল্ডস্মিথ, গ্রে-র ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ তার অনুবর্তী হবেন কেন? ভেবে পাই না। সজনে ফুল, মুরগি কবিতায় চলবে না, কেননা রান্নাঘর এদের জাত মেরে রেখেছে। এটা ভাল লাগে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বাঁশবন' না লিখে 'বেণুবন' লেখাই ভাল। কথাটা মানি না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো লিখেছেন, 'ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা'। কই, কবিতার তো তাতে জাত যায়নি।

বলেছেন, সব কিছু জড়িয়ে বড় দামি কথা বলছেন, এবং বলতে-বলতে যেন উদ্ঘাটন করে দিচ্ছেন নিজেরই কবিতাভাষায় অনুসৃত সেই আদল, বাক্রীতির সেই মডেল যেখানে কথ্যভাষা আর সাধুভাষার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, অবিষ্ট ভাষা ও মার্জিত ভাষার মধ্যে নেই কোনো বিবাদ বা দ্বন্দ্ব। বস্তুত, সাহিত্যশাখার মধ্যে কবিতাই হলো একমাত্র সেই মাধ্যম যেখানে গুরুচণ্ডালির শান্তিপূর্ব সহাবস্থান গ্রাহ্যতা আদায় করে নিতে পারে পাঠকের তরফ থেকে; ব্রাহ্মণ শব্দের পাশে জায়গা করে নিতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করে না ম্লেচ্ছ অপভাষা। এ-বক্তব্যের সমর্থনে নীরেন্দ্রনাথের সমগ্র কবিকৃতি থেকে আমরা তুলে ধরতে পারি এমন অনেক উদাহরণ যেখানে তিনি ধ্রুপদী তৎসম শব্দে প্রযুক্ত বাগবিধির উত্তরাধিকারকে উপেক্ষা না করেও কথা বলতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের সরাসরি চলতি ভাষায়। আর এই বিরল মেলবন্ধনে তাঁর কবিতার জাত তো যায়নি, বরং উচ্চারণে সংযোজিত হয়েছে বাড়তি মাত্রার অন্তর্ব্যঞ্জনা। আপাতত আমি তাঁর অনেকদিন আগে ১৯৭৮-এ প্রকাশিত 'আজ সকালে' বইটি থেকে দুটি কবিতার দৃষ্টান্তের দিকে চোখ রাখছি। তাঁর সব কবিতাই তারিখনির্দেশিত থাকে, আর সেখান থেকেই জেনে নেওয়া যাচ্ছে পর-পর দু-দিনেই (২০/১০ আষাঢ়, ১৩৮৪) দু-টি বৈঠকে লেখা হয়েছিল 'সাদা-কালো ১' এবং 'সাদা-কালো ২'।—

১. 'চোদ্দ টাকার মাছ বেচছ? আর তা-ই আমাকে
খেতে হবে? অ্যাঁ?
আমি কি একজন ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার?'
ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক পাশের স্টলে গিয়ে দাঁড়ালেন,
যেখানে
সাড়ে বাড়ো টাকা কেজিতে মাছ বিক্রি হচ্ছিল।

রুইমাছের ধড়মুণ্ডু আলাদা করে দিয়ে
ব্যাপারী খুব সুন্দর করে হাসল।

'বুঝলেন, স্যার,
সাদা-বাজার এখন কালো-বাজারের ঠিক
দেড় টাকা পিছনে এসে
দাঁড়িয়েছে।'

২. সাদা ও কালোতে গড়া মুর্তিখানি জাগিয়েছে ধাঁধা।
বাধা
ডিঙিয়ে দুরন্ত দুই জলস্রোত ছোটে
গায়ে গা ঠেকিয়ে, মত্ত। বিস্ফারিত ওষ্ঠে তার ফোটে
বিক্ষোভের, যন্ত্রণার, আনন্দের ভাষা।
ভালবাসা
মানুষেরও সম্ভবত এইরকম।
সর্বাঙ্গে জখম
সংঘাতের। তবু পাশাপাশি
থাকে তারা, আঁকে কালো রক্তের ভিতরে সাদা হাসি।

শিরোনাম এক রেখেও, দেখবার মতো হলো, দুই পর্যায়ের বিষয়ভাবনার তারতম্য ও নিহিত দাবি মেনে নিয়ে তিনি কীভাবে কবিতার শরীরের আশ্রয় নিচ্ছেন দু-রকম বাক্প্যাটার্নে। প্রথম দৃষ্টান্তে থাকছে একেবারে খাস হাট-বাজারের চল্‌তি প্রাত্যহিক ভাষা; দ্বিতীয় বৈঠকে যেন 'গায়ে গা ঠেকিয়ে' বদলে গেল প্রকাশভঙ্গিমা, সাদা-কালোর ধারণাটাই মুহূর্তে অন্যমাত্রিক হয়ে উঠলো ধ্রুপদিয়ানার গাম্ভীর্যে।

২০০৬-এর 'বইয়ের দেশ' (এপ্রিল-জুন) -এর একটি সাক্ষাৎকারে কবি হিসেবে নিজের সামাজিক অবসথানটা সরাসরি জ্ঞাপন করেছেন এইভাবে : '' 'কবিতা, কল্পনালতা'য় আমি বিশ্বাস করি না। যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, অর্থাৎ চোখ-কান-স্পর্শ কি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ তৈরি হয়নি তাকে নিয়ে আমি লিখতে পারি না। আমি এমন কোনও মানুষের মুখ আঁকবার চেষ্টা করিনি, যা আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে। আমি শুধু আমার সামনে যে-লোকটাকে দেখেছি, তার মুখটাকেই ধরবার চেষ্টা করেছি। যে ছাড়া আর কেউ আমাকে নাড়া দিতে পারে না।'' ইতিমধ্যে সময়টা আরো পাঁচ বছর এগিয়ে গেছে। সাম্প্রতিকতম ২০১১-র 'কবিসম্মেলন' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় নেওয়া একটি আলাপচারিতার একেবারে শেষ পর্বে এই কথাগুলোরই তালফেরতা আমরা শুনে নিতে পারি, যার মধ্যে ঘটে গেছে আরো নতুন কিছু বক্তব্যের সংযোজন : ''কবিতাকে আরো সময় আমার দেওয়া উচিত ছিল, দিতে পারিনি। যে নিষ্ঠা, যে একাগ্রতা, যে পরিশ্রম, যে যত্ন দেওয়া দরকার ছিল তা দিয়েছি কি? জীবনের অসংখ্য রকমের দাবি, সে দাবিগুলোকেও তো মেটাতে হয়। শুধু দাবি কেন, আমার আসক্তিটাও বড়ো বেশি, ফলে এত ব্যাপারে আসক্ত হয়ে পড়তাম যে কী বলব।... আমি তো কবিতাকে কোনো কল্পনালতা ভাবি না। আমি যে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই, কবিতা তার একটা মাধ্যম, কবিতার মারফত আমার কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি। তাই কবিতার জন্য যা আমার করা উচিত ছিল তা আমি করতে পারিনি, ভেবে কষ্ট পাই।''

এইসব অকম্প্র ধারণা আজো তাঁর কবিতার বীজমন্ত্র, উচ্চারণের পরতে-পরতে আজো তাঁকে বিব্রত করে সমাজজীবনের অসংখ্য অসংগতি, জন্ম নেয় কৌতুক, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ, ধিক্কার, ঝাঁঝালো প্রতিবাদও কখনো-সখনো। আগের মতোই এক-একটা অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে প্রায় ঝুঁটি ধরে তিনি নাড়িয়ে দিতে পারেন আমাদের সুপ্ত চৈতন্যকে, কষাঘাতে পলকেই রক্তাক্ত হয়ে যায় আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব, বিপন্ন বোধ করি আমরা তাঁরই এক-একটা অপ্রিয় সত্যের উন্মোচনে। আগেও যেমন আজো তেমনি তাঁর কবিতার কেন্দ্রিক বিষয় হয়ে হলো সমাজ, সমাজমানুষ, মানবসংসার। কবিকে তিনি হৃষিকেশ বা লছমনঝুলার সন্ন্যাসী বলে ভাবতে চান না, ভাবতে চান একজন সামাজিক মানুষ হিসেবেই, যাকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক নিশ্বাস নিতে হয় একটা রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই। আর সেজন্যই আমাদের বিপন্নতার পাশাপাশি বিষণ্ণ হন তিনি নিজেও, যখন দেখেন চারপাশে 'পলকা ঠুকনো কাচের বাসনের মতোই' ভেঙে পড়ে যাচ্ছে যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধ, সংঘাত ঘনিয়ে উঠছে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে, ভাঙন ধরছে আজন্ম লালিত ধ্যানধারণায়। কবিতার জন্য কুড়িয়ে নেওয়া অভিজ্ঞতা তাৎক্ষণিকতায় অবসিত হয়ে যায় না, বরং তার মধ্যে থেকে যায় চিরন্তন কিছু সময়বোধ, সময়াতীত আবেদন, সমাজব্যাখ্যার সঙ্গে সমাজবীক্ষা। সমাজ-সংসারের দিকে এই তাকিয়ে থাকা তাঁর ফুরোবার নয়, অনিঃশেষ, অবিরাম এই তাকিয়ে দেখা। আমরা ভুলিনি একদিন এই তিনিই কী প্রচণ্ড চাবুক মারতে চেয়েছিলেন 'চতুর্থ সন্তান', 'উলঙ্গ রাজা', 'শকুন, চৌরাস্তায়', কিংবা 'উলটো ঠিকানায়' কবিতাগুলোর সর্বাঙ্গে। ভুলিনি তাঁর 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' কবিতাটির পাগলীর আর্ত ধিক্কার : 'নিস্তার নেই গো বাবুমাশাই,/ এই তোমাদের বাঘসিঙ্গিতে ভরা জঙ্গলের মধ্যে/পাগলদেরও নিস্তার নেই', — শুনতে-শুনতে ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলাম আমরা। আর 'হ্যালো দমদম'-এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এই আজও আমরা সেদিনের মতোই একইরকম আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হওয়ার উপলক্ষ্য খুঁজে ফিরি। আজও তিনি সমাজভাবনা থেকে সরে যাননি এতটুকু, কবিতার জন্যই এখনো তাঁকে উপজীব্য করে তুলতে হয় মানুষের অসহায়তা ও বিপর্যস্ত

জীবনযাপনের খণ্ড-খণ্ড যন্ত্রণার এপিসোডকে। আমাদের চমকে দেয় 'অন্য গোপাল'-এর মতো মর্মান্তিক কবিতা; আত্মজন ছাড়া নিঃসঙ্গ মৃত্যুর নিরুপায় প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে 'ফ্ল্যাটের ভিতরে বুড়ি' কবিতাটিতে; আর নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির ধারণা থেকে উৎপন্ন হতে দেখি যে 'সাকুল্যে তিনজন' কবিতাটির অসাধারণ নির্মাণ, তার মধ্যে থেকে যায় এখনকার ছাঁচে-ঢালা জীবনবিন্যাসের হিসেবে-কষা ইঙ্গিত।

আজকের প্রজন্মে কবিতাচর্চায় যাঁরা মনস্ক হয়ে আছেন, তাঁরা যাই বলুন না কেন, এ-সত্যটাকে সার্বিকভাবেই আমাদের মান্যতা জানাতে হবে যে কবিতা মাধ্যমটা এক কঠিন ও শ্রমসাধ্য শিল্প, তাঁর নির্মাণ প্রক্রিয়া আছে, কারিকুরি আছে, কৃৎকৌশল আছে, আছে এমনকি নিজস্ব ব্যাকরণ, ভাষা নিয়ামক শাস্ত্র, একান্ত এক গ্রামার। অ্যারিস্টটল-প্লেটোকে আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি, কবিতার সংজ্ঞায় এখন বয়ে যেতে দেখছি অন্য ধারণার হাওয়া, এখন কবিতা হয়তো লিখতে চাইছেন অনেকেই শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার জন্মগত অধিকারের সুবাদে, তবু একটা স্বীকার করতেই হয় যে চূড়ান্ত বিচারে একটি কবিতাকে প্রথমত, দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত এবং শেষ পর্যন্ত কবিতাই হয়ে উঠতে হবে। অন্য কিছু নয়। সব কিছু গড়ে তোলবার পেছনে একটা নির্মাণরীতির ব্যাপার থেকে যায়, কবিতার পেছনে এটা নেই যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁর ভুল বার্তাই দিয়ে থাকেন। আরো সহজ করে বলতে গেলে, সবই কবিতার মধ্যেই একটা কী আর কেন থেকে যায়, আর সেটা সামাল দিতে হয় কবিকেই তাঁর অর্জিত তালিম ও কবিতাসংক্রান্ত অনুশীলনকে সম্বল করে। আনুষ্ঠানিক কোনো কর্মশালায় নয়, ওজনদার ওয়ার্কশপে নয়, কিন্তু নিজেরই ভেতরে-ভেতরে নিভৃতে কবিতার ক্লাসে গিয়েই বসতে হয় তাঁকে, নির্ধারণ করে নিতে হয় নিজস্ব আলাদ এক মাতৃভাষা, পাঠ নিতে হয় নিবিড় ছন্দ-শিক্ষার, জেনে নিতে হয় গদ্যকবিতার মধ্যেও কেমন করে কাজ করে তার ছন্দঃস্পন্দ, কীভাবে আর কখন তৈরি হয় অন্ত্যমিল অথবা তির্যক মিলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, কিংবা অমোঘ অথচ অনায়াস একটা চিত্রকল্প কোথায় আমূল বদলে দিতে পারে একটি কবিতার সম্পূর্ণ বিষয় আবহ, সামান্য একটা দৃশ্যের সৌজন্যেও কীভাবে একজন কবি ছেঁকে নিতে পারেন অতলান্ত এক জীবনদর্শন। এসবই হলো উত্তীর্ণ একটি কবিতার যাবতীয় সাফল্যসম্ভব রসদ, তরিকা আর অভিজ্ঞান।

ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা কবিতার প্রতিপালক ও স্তাবকের সংখ্যা অনেক, কিন্তু দুর্ভাগ্যত কোনো অভিভাবক নেই, নেই গর্জন করে ওঠার মতো একজনও গার্জিয়ান। থাকলে তিনি হুংকার ছেড়ে বলতে পারতেন একটা কবিতা হয়ে উঠছে না, আর এটা সর্বার্থেই একটা কবিতা। নীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলি, কবি হিসেবে একটা ঈর্ষণীয়, স্থায়ী ও সম্ভ্রান্ত অবস্থান তো তাঁর নিশ্চিত হয়েই আছে, আমি কিন্তু তাঁকে একজন কঠোর অনমনীয় অভিভাবকের ভূমিকায় ভেবে নিতেও ভারি স্বস্তিবোধ করি। কবিতার শিল্পসত্তা ও কারিগরি নিয়ে তাঁর অনবদ্য ট্রিলজি —'কবিতার ক্লাস', 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা' এবং 'কবিতার কী ও কেন'—আসলে একজন শিক্ষার্থী কবিকে ক্রমশ প্রশিক্ষিত করে তোলবারই নিখুঁত আয়োজন। একেবারে সদ্য গত পরশু দিনই যে কবিতা লেখা শুরু করলো, বলতে পারি, ইতিমধ্যে প্রবলভাবে পাঠকপ্রিয় এই তিনটি বই-ই তার কাছে এক অনন্য দিক্‌নির্দেশক ও আদেশনামার কাজ করতে পারে। উল্লিখিত বই তিনটি থেকে কয়েকটি বাক্য পেশ করি :

ক. ব্যাকরণ বস্তুটাকে প্রথমে বেশ ভালো করে মান্য করা চাই, তবেই পরে সেটাকে দরকার মতো অমান্য করা যায়। ঠিক তেমনি, পরে যাতে মিলের বেড়া ভাঙা সহজ হয়, তারই জন্যে প্রথম দিকে মিলটাকে আচ্ছা করে রপ্ত করতে হবে। ছন্দ কিন্তু সবসময়েই চাই। আগেও চাই, পরেও চাই।

কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি/কবিতার ক্লাস

খ. যুবক, বৃদ্ধ, ছাত্র, কেরানি, চাষি, শ্রমিক—এঁদের কেউই ত্যাজ্য নন। এঁদের সকলকে নিয়েই লেখা যেতে পারে। কিন্তু এঁদের জীবনকে ভালো করে জেনে না নিয়ে লেখা যেতে পারে না। যিনি মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে লিখতে চান, তিনি মধ্যবিত্তের সুখদুঃখের খবর ভালো করে জেনে নিয়ে তারপরে লিখুন। যিনি চাষি-মজুরের কথা লিখতে চান, সর্বাগ্রে তিনি চাষি-মজুরের সুখদুঃখের শরিক হোন। তা না হয়েও, শুধু শখের খাতিরেও, অবশ্য লেখা যায়। কিন্তু সে-লেখা কারও চিত্তে দাগ কাটে না। সে-লেখা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। সাহিত্যে সেটা সত্য হয়ে ওঠে না।

কবির ভূমিকা/কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা

গ. কবিতা কী, এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে, কবিতা আসলে শব্দ নয়, বরং শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণপনা। ভাষার মধ্যে যা কিনা অন্যবিধ একটি দ্যোতনা এনে দেয়। ...অথবা বলতে পারি কবিতা আসলে ভাষার একটি স্তর, কবিতা বলে গণ্য হতে হলে আমাদের ভাবনার শব্দ-রূপকে যে-স্তর উত্তীর্ণ হবে হবেই; আবার, অন্যদিকে, গদ্য রচনাও যে-স্তরকে মাঝে-মাঝে স্পর্শ করে যায়।

কবিতা কী/ কবিতার কী ও কেন

কথাগুলো বলেছেন নীরেন্দ্রনাথ একজন যথার্থ অধিকারসম্পন্ন কবিতাপুরুষ হিসেবে, বলেছেন কবিতার ওপর যাঁর সর্বময় দখল ও কর্তৃত্বকে আমরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছি সেই মানুষ, চূড়ান্ত ঘোষণায় যিনি বিশ্বাস রাখেন, আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারেন যতটা সহজে বলবার দরকার মনে হয়। এবং আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে জানি, শেষ কথা বলবার জায়গায় থেকে যান একজন কবিই, অন্য আর কেউ নয়। এই ভূমিকাটাকেই আমি বলতে চাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত

আদর্শ অভিভাবকের ভূমিকা, যিনি সামনাসামনি নয়, যেন পরোক্ষে হয়তো-বা নেপথ্যে থেকে কবিতাসম্পর্কিত তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান বিলিয়ে দিচ্ছেন একটার পর একটা লেখার উপলক্ষ্যে। গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী যিনি নিতে পারছেন, জোরের সঙ্গে বলা যায় তিনি ঋদ্ধ হবেনই, বুঝে যাবেন কবিতার অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র জুটে যেতে পারে এই লেখাগুলোর বিষয়ে সম্যক পাঠ-অভিজ্ঞতা থাকলে। অথরিটি হিসেবে বলতে-বলতেই একটা সময় তিনি অভিভাবক হয়ে ওঠেন আমাদের কাছে।

অন্যের কথা বলতে পারব না, ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে বলি, নীরেন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতার অনুপুঙ্খ পাঠ নিতে-নিতেই ক্রমশ বুঝে যাই কবিতার সর্বাঙ্গীণ পাঠক্রম কী হওয়া উচিত, কেমন হবে তার শিল্পকৌশল, অন্ধিসন্ধি, সুকুলসন্ধান, কীভাবে তৈরি করে নিতে হয় দেখার মতো চোখ আর শোনার মতো কান, কোন্ কুশলী যোগ্যতা নিয়ে মেলবন্ধন ঘটাতে হয় ভাবনার সঙ্গে ভঙ্গির, বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের, কোথায় আসবে ছন্দের সম্ভাবনা, আর কখন ছন্দোহীনতাই হয়ে উঠবে অনিবার্য, এবং তাঁর কবিতার সঙ্গে নিরন্তর অভ্যস্ত হতে-হতেই শিখে নিতে চেয়েছি, একই কবিতায় বিষয়ের দাবি মেনে ছন্দে শুরু করে আবার একটা সময় বদলে-যাওয়া উপস্থাপনার গরজেই কীভাবে ছন্দ বর্জন করে ঝুঁকে পড়তে হয় আটপৌরে গদ্যের দিকে। এসবই হলো একটা সার্থক কবিতার একান্ত অন্বিষ্ট, আর সেই কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশাপূপণের দিকেই আঙুল তুলে রাখেন তিনি তাঁর প্রত্যেকটি কবিতার বেলায়।

শেষ কথায় আসি। নীরেন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গে। আমি তাঁর কবিতা বইয়ের হাতে-লেখা প্রেস-কপি দেখেছি, যার ছাঁদ যেমন পরিচ্ছন্ন আর নিটোল, তেমনি অনুকরণীয়। সেইসব লেখার পাঠ নিতে-নিতে বুঝেছি, পাণ্ডুলিপি মানে ধুলো-মুঠি-সোনা, পাণ্ডুলিপি মানে একজন কবির সুখ-দুঃখের দলিল, কবিতার সঙ্গে ভাবনাবিনিময়ের ভাষ্য, শাদা পাতার সঙ্গে অক্ষরের সাহচর্যে এক ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞান। তাঁরই ধারণার সঙ্গে মুহূর্তেই আমরা একাত্ম হয়ে যাই।—

> কবিতার পাণ্ডুলিপি ধীরে-ধীরে তৈরি হয়ে ওঠে।
> বন্ধু ও স্বজনবর্গ
> ক্রমে আরও দূরে সরে যায়।
> ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যৌবনের আনন্দ-যন্ত্রণা।
> মনে হয়
> যৎপরোনাস্তি যে-শব্দনিচয় একদা খুবই অর্থবহ ছিল,
> আজ তিলমাত্র অর্থ বহন করে না।
> দিন দীর্ঘ হয়, রাত্রি
> আরও দীর্ঘ, স্মৃতির ভিতরে
> পোকা হাঁটে, হাওয়া ঘুরে যায়।
>
> পুড়ে যায়
> প্রাচীন পুঁথি ও পান্থশালা।

এভাবে পুড়তে-পুড়তেই প্রার্থির পরিণতির দিকে হেঁটে যায় একটা কবিতার আনন্দ-যন্ত্রণার পাণ্ডুলিপি, নিজেকে তর্জমা করতে-করতেই একটা হিরন্ময় মুহূর্তে উদ্বর্তিত হয় কবির যারতীয় অক্ষর সমাচার। আর তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় তাঁর সমূহ বেদনা-সংবেদনা, অভিজ্ঞতা-অভিমান, আলোছায়া, শাদা-কালো, দিনরাত্রি সন্ধি-সমাজ। আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, ওই একটিমাত্র নিখুঁত নিষ্প্রমাদ পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে দেখার যদি সৌভাগ্য হতো ঠিক এই মুহূর্তে লিখতে আসা কোনা তরুণ কবির, আগামী দিনের জন্য তিনি সমৃদ্ধ হতে পারতেন নিজের স্বার্থেই। অবশ্য গ্রহণক্ষমতারও একটা ব্যাপার থাকে এখানে, থাকে পুষ্ট হওয়ার প্রবণতা, এবং উদার চিত্তে মান্যতা জানাবার মতো রুচি।